বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসন
একটি বিশ্লেষণ

ড. অরুণ কুমার গোস্বামী*

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান অনুসন্ধান-প্রচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসনের সম্পর্কের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুসন্ধান করা। সমসাময়িক বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের মতন বাংলাদেশেরও প্রধান দু'টি মৌলিক ইস্যু হচ্ছে 'গণতন্ত্রায়ণ' ও 'আইনের শাসন'। বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি হচ্ছে, আইনের শাসনের ন্যূনতম অনুসরণ ও উপস্থিতি ব্যতীত গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় 'উত্তরণ' এবং 'সংহতকরণ' বা 'গণতন্ত্র' প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' অসম্ভব। আইনের শাসন বিঘ্নিত হলে গণতন্ত্রায়ণও বিপত্তির সম্মুখীন হয়। অপরপক্ষে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে বিদ্যমান আইনকে যুগোপযোগীকরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আর এইভাবে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় চলমান দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশেও গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসনের প্রক্রিয়া দৃশ্যত সহযাত্রী। কারণ গণতন্ত্রায়ণের সমস্যা প্রকারান্তরে আইনের শাসনের সমস্যারই নামান্তর।

Abstract

This paper attempts to inquire into the 'complimentary' relationship between 'democratization' and 'rule of law' in Bangladesh. People of Bangladesh had got involved with the war of liberation in 1971, due to their enthusiasm for the process of 'democratization' and rule of law'. It may be remembered that, even, with in 23 years of independence, the ruling class of Pakistan could not frame and introduce a constitution, which is a fundamental prerequisite for 'democracy' and 'rule of law' in any country. Conversely, the people's representatives had successfully introduced a democratic constitution for independent Bangladesh, on completion of one year after coming out of Pakistan. However, persistent hopes of synthesis between 'democracy' and 'rule of law' have been challenged by the problems of accommodations and institutional arrangements. We try to recognize the problems that stand on the way of complementary relationships between 'democratization' and 'rule of law'. Finally, we also give some suggestions for making a positive headway to face the problems.

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আইনের শাসন শক্তিশালী হতে পারে কি? অথবা আইনের শাসন কি গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়াকে সংহত করতে পারে? উত্থাপিত প্রশ্ন দু'টির মাধ্যমে 'গণতন্ত্রায়ণ' ও 'আইনের শাসন' ধারণা দু'টি পরস্পরের 'পরিপূরক' না 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের উদয় হতে পারে। আর এই সন্দেহ থেকেই 'গণতন্ত্রায়ণ' ও 'আইনের শাসনের' সহযাত্রার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, সাম্প্রতিক বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশেরও প্রধান দু'টি মৌলিক ইস্যু হচ্ছে 'গণতন্ত্রায়ণ' ও 'আইনের শাসন'। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত বাংলাদেশের জনগণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, 'গণতন্ত্র' ও 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় একটি সুষ্ঠু সংবিধান প্রণয়ন ও চালু করা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ২৩ বছরেও সম্ভব হয়ে উঠেনি। অথচ পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের প্রথম বর্ষপূর্তিতেই একটি আধুনিক সংবিধান প্রণয়ন করে তা চালু হয়েছিল বাংলাদেশে। স্বাধীনতা অর্জনের এক দশকের মধ্যে পর পর দু'জন রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর পাশাপাশি বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল তাহেরকে ক্যামেরা ট্রায়েলে ফাঁসি দেয়াসহ অনেক সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রের পাশাপাশি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রায় অধরা থেকে যায়। পর পর এইসব নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যে দুঃখজনক পরিবর্তন সূচিত হয় তা এদেশে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও বৈষম্যকে বৈধতা দেয়ার এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত মূলত সামরিক শাসকগণ তাদের শাসনকে কয়েকটি নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে বেসামরিকীকরণ বা বৈধ করতে চেষ্টা করেছে। এসময় বিরোধীদলগুলো গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। তবে এই সময়কালে তাদের আন্দোলন সফলতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পর অবশেষে ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফলতা লাভ করে। নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশে গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। এরপর ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তম, অষ্টম ও অতি-সম্প্রতি নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের কারণে দেশের গণতান্ত্রিক পরিচিতি আলোচনার পাদপ্রদীপে এসেছে। আর এভাবে আইনের শাসন সম্পর্কিত চলমান আলোচনার পাশাপাশি 'গণতন্ত্রায়ণ' বিষয়টিও অন্যান্য দেশের সাথে, বাংলাদেশেরও বহুল আলোচিত, আকাঙ্ক্ষিত এবং একটি অব্যাহত উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে আইনের শাসনের সফল প্রয়োগের উপর। উদাহরণস্বরূপ ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির একটি স্টাডির কথা তুলে ধরা যেতে পারে। The Quality of Democracies in Europe শীর্ষক এই গবেষণা প্রতিবেদনে গণতন্ত্রের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য যেসব মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে "আইনের শাসন"। অপর দিকে ইউরোপীয় কমিশন গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এগুলো হচ্ছে : বৈধতা (Legitimacy), আইনানুগতা (Legality) এবং ফলপ্রসূ প্রয়োগ (Effective Application)। বলাবাহুল্য এই তিনটি নীতির মধ্যেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের শাসনের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অর্থাৎ আইনের শাসন ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনকে কার্যকর করতে যেমন একটি সংবিধান প্রয়োজন তেমনি সেই সংবিধানের ফলপ্রসূ অনুসরণ ছাড়া গণতন্ত্র সংহত এবং আইনের শাসন কার্যকর হতে পারে না। গণতন্ত্রায়ণে আইনের শাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চৈনিক পণ্ডিত এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অধ্যাপক প্যান ওয়েই (২০০৬)[১] যে গবেষণা করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা সমীচীন। সমসাময়িক বিশ্বে আইনের শাসন ও গণতন্ত্রায়ণের মধ্যে অধ্যাপক প্যান ওয়েই (২০০৬) চার ধরণের সংযোগ চিহ্নিত করেছেন : (১) যেসব দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু আইনের শাসন নেই (Countries with democracy but no rule of law); (২) যেসব দেশে আইনের শাসন আছে কিন্তু গণতন্ত্র

নেই (Countries with rule of law but no democracy); (৩) যেসব দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র উভয়ই আছে (Countries with both rule of law and democracy); (৪) যেসব দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র কোনটাই নেই (Countries with neither)। প্যান বিশ্বাস করেন যে প্রথম ধরনটি হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ। কারণ আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্রের ফলে গোলমাল, দুর্নীতি এবং ভঙ্গুর উন্নয়ন হতে পারে। তবে দ্বিতীয়টি, বিশেষত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যহীন দেশগুলোতে, একটি টেকসই অবস্থা। হংকং এবং সিঙ্গাপুর দ্বিতীয়টির উদাহরণ, এবং এগুলো দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন সরকারসহ উত্তমরূপে শাসিত সমাজ।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন তাড়িত হয়ে এদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আবার এই গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার জন্যই অনাকাঙ্ক্ষিত ও শোকাবহ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণ আন্দোলন করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছে। 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' শ্লোগান বুকে-পিঠে ধারণ করে, নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেমে আত্মাহুতি দানকারী নূর হোসেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার প্রথম স্তর গণতান্ত্রিক উত্তরণ বা ডেমোক্র্যাটিক ট্রাঞ্জিশন সফলতার দিকে এগিয়েছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের জন্য একানব্বইয়ের সাধারণ নির্বাচন, সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধন প্রভৃতিকে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সফলতার উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়। গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসন সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে বহির্বিশ্বে ইতিবাচক ঔৎসুক্যের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ২০০৮ সালের তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্ববিখ্যাত *দি ইকোনোমিস্ট* পত্রিকার ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ১৬৫টি দেশে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জরিপে এই সব দেশের শাসন ব্যবস্থাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা এবং কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনব্যবস্থা। ইকোনোমিস্টের মতে যদিও বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিরাজমান তবে পূর্ণ গণতন্ত্র আছে শুধু ত্রিশটি দেশে। অপরপক্ষে ৫০টি দেশেকে বলা হয়েছে "ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্র"; ৩৬টি দেশ "হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; এবং অবশিষ্ট ৫১টি দেশকে বলা হয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনব্যবস্থা। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থাকে হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের অপেক্ষায় ছিল বাংলাদেশ। ইকোনোমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিট তাই সে সময়ের শাসনকে হাইব্রিড শাসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ২০০৮-এর ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরে নিশ্চয়ই এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তবে এই জরিপের পূর্বে ২০০৬ সালে পরিচালিত আর একটি জরিপে "পূর্ণ গণতন্ত্র" দেশগুলোর মধ্যে উন্নত OECD ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৮ সালের জরিপেও এগুলো পূর্ণ গণতন্ত্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। OECD ভুক্ত রাষ্ট্রের পাশাপাশি "পূর্ণ গণতন্ত্র" হিসেবে আর যেসব রাষ্ট্র স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো দুটো ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, দুটো সেন্ট্রাল আফ্রিকীয় দেশ, একটি আফ্রিকা মহাদেশীয় দেশ। ইকোনোমিস্টের ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গবেষণা অনুযায়ী এশিয়া মহাদেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ আছে দুটো : দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান। আমাদের প্রতিবেশী দুটো দেশ ভারত এবং শ্রীলঙ্কাকে "ত্রুটিযুক্ত গণতন্ত্র" হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে।

গণতন্ত্র সংহতকরণ তথা গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভোটার আইডি কার্ডসহ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন হলো আইনের শাসনের সাথে এর সম্পর্ক কোন ধরনের? প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হলো ছবিসহ ভোটার আইডি কার্ডের জন্য বহু পূর্বেই আইন করা হয়েছে অথচ তার বাস্তবায়ন হয়নি। আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সংহতকরণের প্রচেষ্টা হিসেবে এটিকে উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর দিকে 'গণতন্ত্র আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে' এই অনুকল্পের একটি যথাযোগ্য উদাহরণ হিসেবে ২০০৯ সালের নভেম্বরে 'দেশের জাতির জনক ও প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানকে সপরিবারে হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করার' উদাহরণ উল্লেখ করা যায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার অধীনে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর জাতির জনক ও দেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানকে সপরিবারে হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন শুরু হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারকে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে উৎখাত করে যে সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তারা এই হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে কোনদিন না হতে পারে তার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে তা নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংসদে পাস করিয়ে নিয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছে তারা এই ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করেছে। এবং তারপরেই কেবল এই বিচার সম্ভব হয়েছে। এই সম্পূর্ণ বিষয়টিকে সামরিক শাসন বিরোধী এবং গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের ইতিবাচক সম্পর্কের উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়।

আইনের শাসনের বিষয়টি যদিও সামরিক শাসন চলাকালীন সময়েও একটি উদ্বেগের বিষয় ছিল কিন্তু গণতন্ত্র সংহতকরণ প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে এটি অন্যতম একটি গবেষণা এজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। বর্ণিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসন : একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধ দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় আইনের শাসনের এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রায়ণের অবস্থান অনুসন্ধান করা।

গবেষণা-পদ্ধতি : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসনের পরিস্থিতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রথমে সংক্ষিপ্ত আকারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হবে। এরপর নিকট অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর অবস্থার সাথে তা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হবে। সব মিলিয়ে এই গবেষণা ঐতিহাসিক, আইনগত ও তুলনামূলক পদ্ধতির সংমিশ্রণ।

তথ্য ও উপাত্তের উৎস : প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকেই বর্তমান গবেষণাকর্মটির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সংবাদপত্রের খবর, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সিভিল সোসাইটির সদস্য, সাধারণ মানুষের তথা বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের বক্তব্য প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য প্রভৃতিও প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরপক্ষে দেশের ও বিদেশের গবেষকদের গবেষণা-কর্ম, বিদ্যমান স্বীকৃত গবেষণা-কর্ম প্রভৃতি সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণের কেন্দ্রীয় যুক্তি

বর্তমান প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় যুক্তি হচ্ছে, আইনের শাসনের ন্যূনতম অনুসরণ ও উপস্থিতি ব্যতীত গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় 'উত্তরণ' এবং 'সংহতকরণ' বা 'গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ' অসম্ভব। আইনের শাসন বিঘ্নিত হলে গণতন্ত্রায়ণও বিপত্তির সম্মুখীন হয়। অপরপক্ষে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে বিদ্যমান আইনকে যুগোপযোগীকরণের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আর এইভাবে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ায় চলমান দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশেও গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসনের প্রক্রিয়া দৃশ্যত সহযাত্রী। কারণ গণতন্ত্রায়ণের সমস্যা প্রকারান্তরে আইনের শাসনের সমস্যারই নামান্তর।

মূল ধারণাসমূহের সংজ্ঞা

গণতন্ত্রায়ণ : গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র হতে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও গণতন্ত্র সংহতকরণের প্রক্রিয়া। সহজ কথায় বলতে গেলে বলা যায়, গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে 'গণতন্ত্র' হবার প্রক্রিয়া। লর্ড ব্রাইস ১৮৮৮ সালে সর্বপ্রথম Democratization বা 'গণতন্ত্রায়ণ' পদবাচ্যটি ব্যবহার করেন। ফরাসি বিপ্লবকে ব্রাইস 'গণতন্ত্রায়ণ' প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করে। স্যামুয়েল হান্টিংটনের The Third Wave : Democratization in The Late Twentieth Century শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে হান্টিংটন সমগ্র বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়ণের

অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেছেন। হান্টিংটন গণতন্ত্রায়ণের তিনটি ঢেউ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গণতন্ত্রায়ণের প্রথম ঢেউ উনিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এসেছে। তবে এরপর যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে একনায়কতন্ত্রের উত্থান লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। তবে গণতন্ত্রায়ণের দ্বিতীয় ঢেউ ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যভাগ পর্যন্ত এসে কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। সর্বশেষ ঢেউ শুরু হয় ১৯৭৪ এর দিকে। এটি তৃতীয় ঢেউ। লাতিন আমেরিকা ও কমিউনিস্ট-উত্তর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো থেকে ১৯৭৪ এর দিকে শুরু হয়ে গণতন্ত্রায়ণের তৃতীয় ঢেউ এখনও অব্যাহত আছে।

ভোটাধিকারকে যদি গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখা হয় তাহলে দেখা যায় গণতন্ত্রের প্রথম ঢেউ ধীরগতি সম্পন্ন ছিল। ১৭৯০ সালের দিকে ফ্রান্স থেকে শুরু হয়ে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য হয়ে অধিকাংশ শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহে এটি বিস্তার লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণতন্ত্রায়ণের ঢেউ একের পর এক ছড়িয়ে পড়ছিল। আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে উড্রো উইলসনের উদ্যোগ ছিল এক্ষেত্রে প্রথম, এবং দ্বিতীয়টি বিশেষত পাশ্চাত্যের আফ্রিকীয় ও এশীয় উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। তবে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণে গণতন্ত্রায়ণের প্রথম ঢেউ ব্যর্থ হয়, অপরদিকে সাবেক উনিবেশগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দ্বিতীয়টি ব্যর্থ হয়। ১৯৭০ সালের সূচনালগ্নে গণতন্ত্রায়ণের তথাকথিত তৃতীয় ঢেউ শুরু হয়। ফ্রিডম হাউসের হিসেবে ২০০০ সালের দিকে বিশ্বে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ সংখ্যক দেশ–১২০টি দেশ গণতান্ত্রিক হিসেবে আবির্ভূত হয়। অধিকন্তু শতকরা হিসেবেও অগণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা ৬৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্রায়ণের তৃতীয় ঢেউ দক্ষিণ ইউরোপ থেকে শুরু হয়, ১৯৭৪ সালে পর্তুগালে, ১৯৭৬ সালে স্পেনে এবং গ্রিসে সামরিক স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে। আর এরপর ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দিকে ল্যাটিন আমেরিকা, কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপ, দূর প্রাচ্য, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সাব-সাহারা আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। গণতন্ত্রায়ণের অগ্রযাত্রা লক্ষ করে ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামা তাঁর The End of History and the Last Man শীর্ষক গ্রন্থে উদার গণতন্ত্রকে মানবজাতির চূড়ান্ত সরকারপদ্ধতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৬০ সালের দিকে পণ্ডিতেরা গণতন্ত্রায়ণ বিশ্লেষণে স্বতন্ত্র পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। এই পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, যে কোন দেশে গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে একটি ক্রমাগত, দীর্ঘমেয়াদী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এবং গণতন্ত্রায়ণ হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রপঞ্চ, যা শুধু রাজনৈতিক নয়, এটি অর্থনৈতিক এবং সামাজিকও বটে। এই ধরনের বিশ্লেষণ 'গণতন্ত্রের পূর্বশর্তের' ওপর গুরুত্বারোপ করে। এর মৌলিক অনুকল্প হচ্ছে একটি দেশ অধিকতর ধনী ও সমৃদ্ধ হবার সাথে সাথে এর গণতন্ত্র টেকসই হবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। স্বতন্ত্র পদ্ধতির সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে স্বল্প-মেয়াদী বিষয়গুলো এড়িয়ে দীর্ঘ-মেয়াদী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করা। গণতন্ত্রায়ণের তৃতীয় ঢেউ শুরু হবার পর এটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, বিশেষত মূল পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত গণতান্ত্রিক দেশের বাইরের দেশগুলোর ক্ষেত্রে। অধিকন্তু একসময় যখন দক্ষিণ ইউরোপে ১৯৭০ সালের দিকে, ল্যাটিন আমেরিকায় ১৯৮০'র দিকে, এবং ১৯৯০ সালের দিকে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপীয় ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলোতে গণতন্ত্রায়ণ ছড়িয়ে পড়ে, তখন এই পদ্ধতি স্বল্প-মেয়াদী রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণকে বিশ্লেষণ করতে দুর্বলতা প্রদর্শন করেন।

আইনের শাসন কী?

আইনের শাসন একটি প্রাচীন আদর্শ। দুই হাজার পাঁচশত বছর আগে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো 'আইনের শাসনকে' প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা হিসেবে স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। আইনের শাসনের কোন সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নেই, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং আইনগত প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ ভিন্ন হতে পারে। তবে সাধারণত এটিকে একটি আইনগত-রাজনৈতিক রিজাইম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় যেখানে আইন, কতিপয় স্বাধীনতা উৎসাহিত করা এবং নিয়ম সৃষ্টি এবং একটি দেশ কীভাবে কাজ করে তার ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে মৌলিক ধারণা অনুযায়ী আইনের শাসন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা সরকারি ক্ষমতার আরবিট্রারি এবং এবিউসিভ ব্যবহার হতে

নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। আইনের শাসনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Rules of Law। নাগরিকদের ইংরেজি Rule of Law.[৩] শব্দটি ফরাসি শব্দ La Principle de Legality (আইনানুগততার নীতি) হতে উদ্ভূত, যার দ্বারা বুঝায় যে সরকারের ভিত্তি হবে আইনের নীতি এবং মানুষের নয়। এই ধারণা অনুযায়ী La Principle de Legality নীতি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বিরোধী।

আইনের শাসনের উৎপত্তি অত্যন্ত পুরাতন। রাজা তৃতীয় হেনরির শাসনামলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বিচারক ব্রাক্টন বলেন[৪] The king himself ought to be subject to God and the law, because law makes him king. অর্থাৎ রাজা নিজে ঈশ্বর ও আইনের অধীন, কারণ আইন তাঁকে রাজা বানিয়েছে। এডওয়ার্ড কোককে আইনের শাসনের ধারণাটির উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন যে রাজা অবশ্যই ঈশ্বর ও আইনের অধীনে থাকবেন এবং এভাবে নির্বাহী বিভাগের এখতিয়ারের উপর আইনের প্রাধান্য সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে প্রফেসর আলবার্ট ভেন ডাইসী (১৮৩৫-১৯২২) ১৮৮৫ সালে তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ An Introduction to the Study, The Law of the Constitution (সচরাচর Law of the Constitution হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়)-এ তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ধারণাটির সম্প্রসারণ করেন। ডাইসী আইনের শাসনের বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো : (১) আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান (everyone is equal before law); (২) আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন না করা অবধি কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না (no one can be punished unless s/he is in clear breach of the law) (৩) আদালতের ঊর্ধ্বে কোন আইন নাই (there is no set of laws which are above the courts)। যদিও ডাইসীর প্রথম দুটি ধারণা সম্পর্কে খুব স্বল্পই তর্ক করার আছে, তবে তৃতীয়টি আসলে বিতর্কিত। তবে ডাইসীর গ্রন্থটি ব্রিটিশ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যাবলি ধারণ করে আছে।

প্রকৃতপক্ষে আইনের শাসন দ্বারা ক্ষমতার স্বেচ্ছামূলক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের দ্বারা না হয়ে স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত বিধিমালা দ্বারা একটি রাষ্ট্রের জনগণকে শাসন করা বোঝায়। নাগরিকদের প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়া হয় সংবিধান বা আইন আনুযায়ী কোনটা করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে, একটি ন্যায়সঙ্গত সরকারের দ্বারা নাগরিকেরা ন্যায্য আচরণ পাবার আশা করতে পারে।

The Morality of Law শীর্ষক গ্রন্থে মার্কিন আইন বিশ্লেষক লন ফুলার আইনের আটটি উপাদানের কথা বলেন, যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী একটি সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ফুলার নিচেরগুলো উল্লেখ করেন :

(১) আইন অবশ্যই থাকতে হবে এবং ওইসব আইন সরকারি কর্মচারিসহ সকলেই মান্য করবে। (২) আইন অবশ্যই প্রকাশিত হতে হবে। (৩) প্রকৃতিগতভাবে আইন অবশ্যই সম্ভাবনাময় হবে, যাতে আইনটি পাস হবার পর তার ফলাফল বাস্তবায়ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আদালত এক ব্যক্তিকে তার কৃত অপরাধ, যা এধরনের আচরণ নিষিদ্ধ সম্পর্কিত আইন পাস হবার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে, এর জন্য শাস্তি দিতে পারে না। (৪) অন্যায়ভাবে বাস্তবায়ন পরিহার করতে যুক্তিসঙ্গত বিবরণসহ আইন লিখিত হওয়া উচিত। (৫) আইন অবশ্যই স্ববিরোধিতাকে পরিহার করবে। (৬) আইন অবশ্যই অসম্ভব আদেশ-নির্দেশ দিবে না। (৭) বিধিমালার আনুষ্ঠানিকীকরণকে অনুমোদন করতে সময়ের ধারাবাহিকতায় আইন অব্যাহতভাবে অপেক্ষা করবে। তবে অন্তর্নিহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে আইন অবশ্যই সময়ানুগ সংশোধন অনুমোদন করে। (৮) ঘোষিত বিধানের সাথে অফিসিয়াল পদক্ষেপগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এই আটটি উপাদান স্পষ্ট ও বোধগম্য হতে পারে। তবে বাস্তব পৃথিবীতে এগুলো আসলে বাস্তবায়ন করা কঠিন। কারণ সমাজের রাজনৈতিক পছন্দ অনুযায়ী সংঘর্ষ নিরসনের নিমিত্তে একটি লক্ষ্যের উপর আর একটি লক্ষ্যকে সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, অতিরিক্ত বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্টকৃত অতিরিক্ত সংখ্যক আইন প্রণয়ন আইনগত ব্যবস্থাকে কঠোর করে তুলতে পারে। অনমনীয়তা একটি দেশের আদালতকে প্রতিটি মামলার মানবিক উপাদানকে অবজ্ঞা করতে পরিচালিত করতে

পারে। একই সাথে শুধু সম্ভাবনাপূর্ণভাবে প্রয়োগ করার পরিবর্তে কিছু কিছু আইন ভূতাপেক্ষভাবে প্রয়োগ অথবা অতীত আচরণকে বুঝাতে পারে, কারণ এগুলো প্রশ্নকৃত আচরণ সংশোধন করার তালিকাভুক্ত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে ভারসাম্যের নিমিত্তে সমাজগুলোকে প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আইনের শাসনের সংজ্ঞা কী তা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ বিদ্যমান। কীভাবে 'আইনের শাসন' পদবাচ্যটি জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয় তার উপর সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে এই ধারণাটি "একটি খোলা-ধারণা যা স্থায়ী বিতর্কের বিষয়"।

এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে আইনে শাসনের দ্বারা আবদ্ধ এবং ভালোভাবে ক্রিয়াশীল আইন ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান এবং একটি সরকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। ফলে উন্নয়নকর্মীগণ আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যান্য মূল্যবান লক্ষ্যসমূহ আংশিকভাবে হলেও আইনের শাসনের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল এবং পরিবর্তনশীল জাতিসমূহের নীতিনির্ধারকেরা তাদের দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণের পথ অনুসন্ধান করছেন।

প্রকৃতপক্ষে আইনের শাসন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারণার সমষ্টি, এগুলো হচ্ছে :

১. সরকারি সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত আইন এবং নিয়ম অনুযায়ী প্রণীত হয়।
২. ঘটনার পরে (এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো) সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না।
৩. নিয়মকানুন যতবেশি সম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়।
৪. জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি নিয়ে নেয়ার পূর্বে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং লিখিত যথাযথ নিয়মকানুনের প্রক্রিয়া নাগরিকদেরকে আদালত অবহিত করে।
৫. তাদের সিদ্ধান্তের জন্য আদালত আইনের উপর স্থিত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করবে।

আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন বিষয় যার উপর স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার ভিত্তি করে আছে। মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে অকথিত সংখ্যক মানুষ আমাদের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা, ভাগ্য এমনকি জীবনের ন্যায় কঠিন মূল্য দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সংরক্ষণ করা না হলে, আইনের শাসন বিভিন্নমুখী অপচেষ্টা, অবহেলা এবং নীল নকশার মাধ্যমে নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে।

গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসন

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুযোগ ও ন্যায্যতার জন্য আইনের শাসন শক্তিশালীকরণের উদ্যোগ গ্রহণার্থে একটি বহুজাতিক ও বহুবিষয়ভিত্তিক প্রকল্প হচ্ছে ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট। এই উদ্যোগের প্রধানতম উপাদান হচ্ছে আইনের শাসনের সূচক বা রুল অব ল ইনডেক্স। আইনের শাসনের সূচক হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইনের শাসনের প্রতি কিভাবে একনিষ্ঠ থাকছে তার বিস্তারিত এবং ব্যাপকভিত্তিক চিত্র প্রণয়নার্থে একটি নতুন পরিমাণগত মূল্যায়ন। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বিরাট সংখ্যক চলকের সাহায্যে কার্যসম্পাদন পরিমাপ করে এই সূচক একটি রোড ম্যাপ প্রদান করে যা অভীষ্ঠ সংস্কারের নিমিত্তে সুযোগ চিহ্নিতকরণে সরকারসমূহ, প্রাইভেট এক্টর, এবং সিভিল সোসাইটিসমূহকে সাহায্য করতে পারে। এই সূচকটিতে চারটি নীতিমালা বা বিধিবদ্ধতার ভিত্তিতে ১৬টি উপাদান ও ৬৮টি সহ-উপাদান আছে। এই চারটি নীতিমালা হচ্ছে : (১) সরকার ও এর কর্মকর্তাগণ এবং শাখাসমূহ আইনের অধীনে জবাবদিহিযোগ্য; (২) আইনগুলো হচ্ছে স্পষ্ট, প্রকাশিত, স্থিতিশীল ও সুষ্ঠু, এবং ব্যক্তিবর্গ ও সম্পত্তিসহ মৌলিক অধিকারকে সুরক্ষা দেয়; (৩) যে আইনের দ্বারা আইন সংরক্ষিত, পরিচালিত ও বলবৎকৃত তা স্পষ্ট ও দক্ষ এবং তাতে সহজে প্রবেশ করা যায়। (৪) যথেষ্ট সংখ্যক এবং যথোপযুক্ত সম্পদরাজিসম্পন্ন এবং যারা যেসব কমিউনিটিকে সেবা প্রদান করে তাদের প্রতিকৃতি ধারণকারী দক্ষ স্বাধীন এবং নৈতিকগুণসম্পন্ন বিচারক,

এটর্নি, অথবা প্রতিনিধিবর্গ এবং বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তায় সমৃদ্ধ বিচার ব্যবস্থায়-প্রবেশাধিকার। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট আইনের শাসনের সূচক প্রকাশ করেছে। যদিও ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের শাসনের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রণয়ন করা হয় নাই, তবে এই সূচক নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান ও সহ-উপাদান বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট এর আইনের শাসনের সূচকে ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশের আইনের শাসনের পরিস্থিতি পরিমাপ করবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসন

বাংলাদেশে গণতন্ত্রায়ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আইনের শাসন বিষয়টিকে আমরা দুটি ভাগ করে উপস্থাপন করতে পারি : (১) সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও (২) বাস্তব পরিস্থিতি। বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনের শাসন। সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের মৌলিক লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সমাজতান্ত্রিক, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা – সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে।'

এই অঙ্গীকারের সাথে মিল রেখে আইনের শাসনের জন্য সংবিধানে নিম্নোক্ত ইতিবাচক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে : সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের দ্বারা সমান সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য। ৩১ নং অনুচ্ছেদে আইনের সুরক্ষা পাওয়া এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান হবার বিষয়টি প্রত্যেক নাগরিকের অবিভাজ্য অধিকার হিসেবে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। আইনের বিধান ছাড়া যে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, খ্যাতি বা সম্পত্তির ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ঘটানো যাবে না। অনুচ্ছেদ ৪৪ এবং ১০২ তে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১৮টি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৭ এবং ২৬ দ্বারা আইনসভার উপর সীমাবদ্ধতা অরোপ করা হয়েছে যে সংবিধানের ব্যবস্থার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইন পাশ করা যাবে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭, ২৬ এবং ১০২ (২) দ্বারা সুপ্রিম কোর্টকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট নির্বাহী এবং আইন বিভাগের যে কোন কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও বৈধতা পরীক্ষা করতে পারবে এবং যদি তারা সাংবিধানিক সীমানা লঙ্ঘন করে তাহলে সেগুলোকে বাতিল করে দিতে পারে। সংবিধানের ৭(১), ১১, ৫৫, ৫৭ এবং ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগণের নিকট দায়বদ্ধ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান দ্বারা শাসিত হবার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের এই সকল বিধানাবলি কার্যকর করা হয়েছে।

গণতন্ত্রায়ণ ও আইনের শাসনের বাস্তব পরিস্থিতি

গণতন্ত্রকামীদের এটি ভুললে চলবে না যে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন একই সাথে চলা কঠিন। ক্রটিযুক্ত গণতন্ত্র প্রকারান্তরে আইনের শাসনকে ব্যাহত করতে পারে, পাশাপাশি খারাপ আইন গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে পারে। বিশ্বব্যাপী আইনের শাসনের নামে অনেক ক্রটিযুক্ত গণতন্ত্র মানবাধিকারকে ভূ-লুণ্ঠিত করেছে, বৈষম্য জাগিয়ে তুলেছে এবং বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আর এভাবে গণতন্ত্রের প্রকৃত স্পিরিটকে পরাভূত করেছে। উন্নত দেশসমূহের আইনগত ইতিহাস ঘটলে দেখা যায় যে অষ্টাদশ শতক এবং ঊনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে সংঘটিত আইনের বিপ্লব ফলে শিল্পপতি, ভূ-স্বামী এবং কার্পোরেট ক্ষমতাসমূহের ক্ষুদ্র সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এবং স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে।

গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যায়। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনের শাসন ভিত্তিক প্রশাসন দ্বারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে। একইভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থ-সচেতন আইন-প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও নিরাপদ করা যায়। বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও আইনগত ব্যবস্থা পর্যালোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের সম্পর্ক পরীক্ষা করা যায়।

আইনের দ্বারা গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হবার নমুনা

যেসব দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা আছে সেসব দেশে গণতন্ত্র দুর্বল, অসম্পূর্ণ এবং খুবই সীমিত। এর ফলে গণতান্ত্রিক নীতিমালা এবং নাগরিকদের স্বাধীনতা শ্বাসরোধ বা দুর্বল করার মত অদক্ষ, খারাপ বা কালো আইন তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের আইন ও অধ্যাদেশ ছাড়াও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন-সংবিধান থেকে এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

নিবৃত্তিমূলক আটকাবস্থা (বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ) : এই অনুচ্ছেদ দ্বারা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটকাদেশ দেয়া যায়। কারণ জজ হবার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং একজন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্তকর্তার সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদের গঠন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অনুচ্ছেদ দ্বারা 'জনস্বার্থে' আটকাদেশের কারণ প্রকাশ্যে স্বীকৃতি জানানো যেতে পারে।

সংসদ সদস্যদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করা (অনুচ্ছেদ ৭০) : কালো আইন বা খারাপ আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংশ্লিষ্ট এম.পি. সভায় তার সদস্যপদ হারাতে পারে। একই কারণে ভোটের দিনে ভোট দেয়া হতে বিরত অথবা সংসদে অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ হারাতে পারেন।

সংসদে অনুপস্থিতি অনুমোদন করা (অনুচ্ছেদ ৬৭) : পার্লামেন্ট হতে এমপিগণ ৮৯ দিন পর্যন্ত কোন অনুমোদিত ছুটি ছাড়াই অনুপস্থিত থাকতে পারেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট এম.পির নির্বাচনী এলাকার ভোটার তথা জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ খুবই দুর্বল ও অনুপযুক্তভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়।

অ-বাস্তবায়ন গণতন্ত্রকে দুর্বল করে : একসেট উন্নতমানের আইনও যদি দক্ষ আইনগত, বিচারিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত না হয় তাহলে তা অর্থহীন হতে পারে। বেশিরভাগ ভুক্তভোগী যদি শ্রদ্ধা পোষণ না করেন তাহলে গণতন্ত্র ও সুশাসনের লক্ষ্যে প্রণীত সাংবিধানিক বিধি-বিধান কোন কাজেই আসবে না। অমান্যকৃত বা দুর্বলভাবে অনুসৃত আইনের নিম্নোক্ত উদাহরণ দেয়া যেতে পারে : অনুচ্ছেদ ৭৮ (১), (২), (৩), (৪), (৫) এবং সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার অনুযায়ী কোন সংসদ সদস্যের সংসদে দেয়া বক্তব্যের বা সংসদের প্রতিবেদন, দলিল, ভোট বা কার্যপ্রণালী অনুযায়ী আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

পার্লামেন্টের স্টান্ডিং কমিটিগুলো আইনের খসড়া পরীক্ষা করা, আইন কার্যকর করা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড অথবা প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। (অনুচ্ছেদ : ৭৬)

এভাবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৭৭ ন্যায়পাল পদ-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত, অনুচ্ছেদ নং ১৩২, মহাহিসাবরক্ষক কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক রিপোর্ট এবং ১৪১ অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উত্থাপন; অনুচ্ছেদ ১৪৫ (ক) অনুযায়ী বিদেশের সাথে সম্পাদিত সব চুক্তি পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে হবে।

সংসদীয় পদ্ধতির বিধি-বিধান : কমিটির নিকট উত্থাপিত হবার পূর্বে এমনকি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হবার পূর্বেও যেকোন ব্যক্তিকে দেখার অনুমতি দিতে পারেন (অনুচ্ছেদ : ২০৭-২১২)।

উপসংহার

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণের পূর্বে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে তার সবই ছিল নিয়মতান্ত্রিক। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্র' ও 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার জন্যই এইসব আন্দোলন ও সংগ্রামে এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের সমস্ত প্রকার জংলি ও বে-আইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা এদেশে 'গণতন্ত্র' ও 'আইনের শাসন' পরিচালিত একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখত। যেখানে থাকবে না অন্যায়, অবিচার, শোষণ আর

বঞ্চনা। একসাগর রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হবার পরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশকে সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বর্ষপূর্তিতে একটি সংবিধান কার্যকর হওয়া শুরু হয়। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত এই সংবিধানটি ছিল একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধান। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দেশে 'গণতন্ত্র' ও 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া থমকে যায়। আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে কোনদিন না হতে পারে তার জন্য পাকাপোক্তভাবে সাংবিধানিক ও আইনি ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু 'গণতন্ত্র' ও 'আইনের শাসন' ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এদেশের মানুষ অনেক বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে অবশেষে সেই বিচারের রায় এবং রায়ের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলেও একটি বিচারই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি এটিও লক্ষণীয় যে দেশের আদালতে বিচারাধীন মামলার স্তূপ পড়ে রয়েছে। ২০০৯ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী এদেশের বিভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ৪,৮৪,৮৩২ টি মামলা বিচারাধীন ছিল। যা বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার বহিঃপ্রকাশ। ফরে 'জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি এবং মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেসির আদালত খোলা হয়েছে। ৬৫৫টি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদসহ ৪২৭৩টি পদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে 'গণতন্ত্র সংহতকরণ' এবং 'আইনের শাসন' কার্যকরকরণের জন্য এদেশকে আরও অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে।

সুপারিশমালা

শাসন ব্যবস্থা এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, এবং কার্যকারিতা অর্জনের লক্ষ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে। এ ধরনের শক্তিশালীকরণের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান হতে পারে নিম্নরূপ :

সংবিধানের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন : স্থানীয় সরকার, অমবাডসম্যান এবং বিচারকদের ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের যোগ্যতার উপর সাংবিধানিক নিয়মকানুন যথোপযুক্তভাবে কার্যকর করতে হবে।

তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ : নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড তদারক করার কাজে জাতীয় সংসদ যাতে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য ৭০ নং অনুচ্ছেদের সংশোধন করে এর কার্যকারিতা অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেটের মধ্যে সীমিত করা যেতে পারে। ৬৭ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা যায়। অনুচ্ছেদ নং ৭৬ সংশোধন করে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদীয় কমিটি গঠন আবশ্যকীয় করা যায়। নজরদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক অমবাডসম্যান অফিস ও মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা দরকার।

আইনগত সংস্কার : আইনগত সংস্কারের মধ্যে নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য, প্রার্থীদের অযোগ্যতা বর্ধিতকরণ, রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলককরণ, নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত মীমাংসাকরণ ইত্যাদি এবং তথ্য অধিকার আইন এবং সাক্ষী এবং ভুক্তভোগী সুরক্ষা আইন ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা।

তথ্যপ্রবাহ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ : এক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ বলতে যা বুঝায় তা হলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিসগুলোর পূর্ণমাত্রায় অটোমেশন, এসব প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট স্টাফদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ।

আইনগত শিক্ষা : নীতি প্রণয়নে সমাজের সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গণমাধ্যম ও এনজিওসহ সরকারি সংস্থা যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

এটা কোন অতিশয়োক্তি নয় যে গণতন্ত্র তখনই যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারে যখন এর অনুশীলন শুধু নির্দিষ্ট সময় পর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্যেই সীমিত থাকে না। গণতন্ত্র যথাযথভাবে তখনই কাজ করে যখন জনপ্রতিনিধিগণ তাদের কর্মপদ্ধতিতে, মনোভাবে এবং কার্যকলাপে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের স্বাক্ষর বহন করে, যখন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। যখন বিচার বিভাগ এবং তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে এবং দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করতে পারে। গণতন্ত্র তখনই জীবন্ত থাকে যখন নাগরকিরদের তথ্য-প্রাপ্তি এবং অভিমত প্রকাশ করার অধিকার থাকে।

টীকা :

১. Pan Wei (2006), "Toward a Consultative Rule of Law Regime in China", in Suisheng Zhao ed. (2006) Debating Plitical Reform : Rule of Law Vs. Democratization; USA : An East Gate Book.

২. দেখুন Samuel P. Huntington (1991), The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century, Norman and London: University of Oklahoma Press.

৩. Wolfgan L.P. Massey (2001), "Conceptual objections against the growth of administrative law", in Administrative Law, Lucknow: Eastern Book Company, p. 21.

৪. দেখুন M.A. Halim (1998), Rule of Law, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective, M. Yousuf Ali Khan ed. Dhaka : Rico Printer, p. 345.

তথ্যসূত্র :

Davis, Diane E. (1953), *Undressing the Rule of Law: Democratization and the Dark Side of Police Reform in mexico, Latin American Plitics & Society*, Volume 48, Number 1, Spring 2006, pp. 55-86.

Emerson, Rupert (1960), *From Empire to Nation : The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples*, Boston: Beacon Press, pp. 295-328

Ghai, Yash (1986), *"The Rule of Law, Legitimacy, and Governance", International Journal of the Sociology of Law,* 14:179-208 (1986)

Grote, Rainer (1999), *"Rule of Law, Rechtsstaat and Etat de Droit", in Christian starck, ed. Constitutionalism, Universalism and Democracy- A comparative Analysis, Baden-baden: Nomas Verlagsgesellschaft.*

Hayek, Friedrich (1960), *The Constitution of Liberty, Chicago*: University of Chicago Press

Hobson Charles F. (2000), *The Great Chief Justice: John Marshall and the Rule of Law*, Kansas : University of Kansas.

Khan, Zillur R., *Sovereignty, National Interest and the Challenges of Democratization in Bangladesh.*

Website : http//www.bdiusa.org/publications/

Laporte, R. (1972), *"Pakistan in 1971 : The Disintegration of Nation"*, Asian Survey 12(2): 97-108

Lon, Fuller (1984), *The Morality of law*, Yale University Press.

Maravall, Jose Maria and Przeworski, Adam eds. (2003), *Democracy and the Rule of Law*, Cambridge: Cambridge University Press.

Mihr, Anja (2009), *"From Reconciliation to the Rule of Law and Democracy"* Web Journal of Current Legal Issues.

Mousseau, Michael (2000), Market Prosperity, *Democratic Consolidation and democratic Peace*, Journal of Conflict resolution 44 (4): 472-507.

Przeworski, Adam et al. (2000), *Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990,* Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, Adam (2009), *The Mechanics of Regime Instability, in Journal of Politics in Latin America, 1 (1)*, 5-36, Retrieved February 14, 2010, from http/www.sub.sub.uni-hamburg.de/giga/jpla/article/view/20/20.

Putnam, Robert D. et al (1993), *Making Democracy Wrok: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton Press.

Rawls, John (1999), *A Theory of Justice (revised edition),* Oxford: Oxford University Press.

Rummel, Rudolph J., *"Statistics of Democide : Genocide and Mass Murder Since 1900".*

Soper, Philip (1984), A Theory of Law.

Schaffer, Fredric C. (1998), *Democracy in Translation : Understanding politics in an Unfamiliar Culture*, Ithaca, NY: Cornell University Press.

Wang, Chin-Shou (1007), *"The Rule of Law and Democracy as Movement Strategy : Explaining Judicial Independence Reform in Taiwan"*, Paper presented at Conference titled Law and Democratisation in Taiwan and Korea: Twenty years Experience, UW Law School, October 19-20, 2007.

Weingast, Barry R. (1997), *"The Political Foundations of Democracy and the Rule of Law"*, American Political Science Review 91(2) 245-264

Weingast, Barry R. (2009), *Why are Developing countries so Resistant to the Rule of Law, Welzel, Christian and Inglehart, Ronald (2008), "The Role of Ordinary People in Democratization"*, Journal of Democracy 19: 126-40.

Wittfogel, Karl August (1957), *Oriental Despotism: a comparative study of total power,* Yale University Press.

Zakaria, Fareed (2003), *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, New York: W.W. Norton.

UNDP Programming for Justice (2009), Access for All, A Practitioners Guide to a Human Rights Based Approach to Access to Justice.